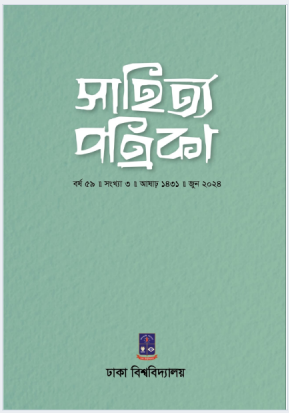

Vol. 59 | No. 3 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সংস্কৃত বর্ণমালা: একটি তাত্ত্বিক অন্বেষণ

Volume	59
Issue	3
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Promatha Mistry
Published online	April 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v59i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i3.5
Pages	91-111
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩১॥ জুন ২০২৪
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i3

DOI: 10.62328/sp.v59i3.5
প্রবন্ধ জমাদান: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পৃষ্ঠা: ৯১-১১১

সংস্কৃত বর্ণমালা: একটি তাত্ত্বিক অন্বেষণ

প্রমথ মিস্ত্রী
সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: promathamistry@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ধ্বনি বলে। আর ধ্বনির লিখিত রূপকে বর্ণ বলে। বর্ণ হলো ভাষা লেখার প্রকৃত মাধ্যম। মানুষ বর্ণের দ্বারা তার মনের ভাষা লিখিতরূপে প্রকাশ করে। ভাষা প্রকাশের প্রয়োজন থেকেই বর্ণের উদ্ভব। তাই বর্ণ হচ্ছে অর্থবহ প্রণালিবদ্ধ ধ্বনির লিখিত প্রতীক। ভাষাকে উচ্চারণে বা লিখিতরূপে জীবন্ত রাখার জন্য প্রয়োজন বর্ণের। পরস্পর ভাব-বিনিময়ের জন্য এক এক সমাজের মানুষ গড়ে তুলেছে এক এক রকম ধ্বনি-ব্যবস্থা ও বর্ণ-ব্যবস্থা। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক লিখিতভাব বিনিময়ের জন্য বর্ণ একটি উন্নত মাধ্যম। যেমন, বৈদিক ও বাংলা ভাষার বর্ণ হচ্ছে সেই মাধ্যমের এক একটি রূপ। কেননা বর্ণ মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির লিখিতরূপকে ধারণ এবং বহন করে। মানুষ বর্ণের মাধ্যমে তার সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসকে চিরস্থায়ী করে রাখতে পারে। লক্ষণীয়, পৃথিবীতে এমনও ভাষা আছে যার নিজস্ব বর্ণ নেই। সংস্কৃত ভাষা হচ্ছে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। সে অন্য ভাষার বর্ণকে গ্রহণ করে স্বমহিমায় যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে। সংস্কৃত ভাষা বৈদিক ভাষার সংস্কারকৃত রূপ হলেও বৈদিক ভাষার বর্ণব্যবস্থার (দেবনাগরী বর্ণমালা) মাধ্যমেই তার আত্মপ্রকাশ। তবে আমাদের মধ্যে একটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা, দেবনাগরী বর্ণমালাই বুঝি সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। উল্লেখ্য, সংস্কৃত ভাষা শুধু দেবনাগরী বর্ণমালার মাধ্যমেই নয়, বাংলাসহ পৃথিবীর অনেক উন্নত ভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে কী নেই তা অন্বেষণ করে সংস্কৃত ভাষা কীভাবে দেবনাগরী ও বাংলা ভাষার বর্ণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তার একটি তাত্ত্বিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

মূলশব্দ

ব্রাহ্মী বর্ণমালা, দেবনাগরী বর্ণমালা, বাংলা বর্ণমালা, শিবসূত্র, প্রত্যাহার, অচ্, প্লুতস্বর, সন্ধ্যক্ষর, হল্, অযোগবাহ বর্ণ, অল্।

ভূমিকা

প্রাক্ পর্বেই সংস্কৃত ভাষার উৎস, কাল ও দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাবংশসমূহের অন্যতম হলো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের আবার অন্যতম প্রাচীন শাখা হচ্ছে ইন্দো-ইরানীয় শাখা। এই ইন্দো-ইরানীয় শাখার অন্যতম প্রাচীন শাখা 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য'। এই শাখা থেকেই বৈদিক ভাষা এসেছে। ভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যযুগ ১২০০ থেকে ৮০০ খ্রিষ্টপূর্ব। আর ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ভারতে আর্য আগমনের সময় আনুমানিক ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব এবং বেদ সংগ্রহের সময় ১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৯: ২১)। বেদ বৈদিক ভাষায় লিখিত। আর সংস্কৃত ভাষা বৈদিক ভাষার রূপান্তর। একসময় 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা' কথ্য ভাষা রূপে বিদ্যমান ছিল [দৃষ্টান্ত: যূয়ম্ অশ্বং স্পশ্যথ (তোমরা ঘোড়াটি দেখছ), স করোতি/কৃণোতি (সে করছে)]। এই ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ আমরা বৈদিক তথা সংস্কৃতে দেখতে পাই [দৃষ্টান্ত: বৈদিক ও সংস্কৃত: যূয়ম্ অশ্বং পশ্যথ, বৈদিক: স কৃণোতি/করোতি, সংস্কৃত: স করোতি] (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৯: ২১)। উল্লেখিত দৃষ্টান্ত থেকে বলা যায়, বৈদিক ভাষায় একই শব্দের একাধিক রূপ ছিল। একসময় এই শব্দবহুল বৈদিক ভাষায় অনেক 'অপশব্দ' প্রবেশ করেছিল। ফলে এই ভাষার সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই পরবর্তী সময়ে বৈয়াকরণ পাণিনি (সূত্রকার), কাত্যায়ন (বার্ত্তিককার), পতঞ্জলি (ভাষ্যকার) প্রমুখদের হাতে বৈদিক ভাষা সংস্কারকৃত হয়। বৈদিক ভাষার এই সংস্কারকৃত রূপই সংস্কৃত ভাষা। তাই বলা হয় সংস্কৃত ভাষা বৈদিক ভাষার পরিমার্জিত রূপ। 'বৈদিক ভাষা'র কতদিন পরে প্রথম 'সংস্কৃত ভাষা' চালু হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য' ভাষার দুটি রূপ: এক. বৈদিক (প্রাচীনতম নির্দশন: ঋগ্বেদ এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের ভাষা) এবং দুই. লৌকিক (নবীনতর নিদর্শন: রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও বিভিন্ন লৌকিক আখ্যান-উপাখ্যানসহ তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তির দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা)। এই শেষোক্ত ভাষার পাণিনি অনুশাসিত রূপই সংস্কৃত ভাষা। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুকুমার সেন বৈদিক ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, বৈদিক (অর্থাৎ ঋগ্বেদের) ভাষাই হচ্ছে ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক রূপ অর্থাৎ প্রথম সাধু ভাষা (সুকুমার ২০১৫: ৮৪)। আবার কেউ কেউ বলেন, আর্যরা তাদের চিন্তা-ভাবনা যে ভাষায় ব্যক্ত করে সাহিত্য (ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতি) রচনা করেছেন এককথায় সে ভাষাকেই বৈদিক ভাষা বলে। সেন মহোদয় সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে বলেন, 'সংস্কৃত হইল বৈদিক যুগের অন্তে কথ্য ভাষা হইতে লেখ্য ভাষায় প্রত্যাবর্তন। স্বভাবতই এ প্রত্যাবর্তন অন্ত্য বৈদিক স্তরের শেষ রচনা উপনিষদের ভাষার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। মোট কথা এই যে সেকালে "সংস্কৃত" বলিয়া, বৈদিক হইতে ভিন্নতর ভাষা বুঝাইত না। বৈদিক ভাষাও সংস্কৃতের আওতার বাহিরে ছিল না' (সুকুমার ২০১৫: ৮৭)। এককথায় বলা যায় 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা'র প্রাচীনতম সাহিত্যিক রূপ সাধু ভাষা অর্থাৎ বৈদিক ভাষা। এ ভাষার দৃষ্টান্ত খুঁজতে হলে আমাদের বেদ তথা বৈদিক সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। আর্যদের বৈদিক ভাষার একটি দৃষ্টান্ত দেবনাগরী ও বাংলা লিপির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

এক. উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচ-
মুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

এক. উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচ-
মুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা ১০/৭১/৪ (রমেশচন্দ্র ২০০০: ৬৬২)

[বাংলা অনুবাদ: কেউ কেউ কথা দেখেও কথার ভাবার্থ গ্রহণ করতে পারে না, কেউ শুনেও শোনে না। যেমন প্রেম পরিপূর্ণা সুন্দর পরিচ্ছদ ধারিণী ভার্যা আপন স্বামীর নিকটে নিজদেহ প্রকশ করেন সেরূপ বাক্ (ভাষা) কোনো কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন।]

এভাবে ভারতীয় আর্যরা সাহিত্যিকরূপে যে ভাষা ব্যবহার করত তাই বৈদিক ভাষা। যেহেতু সংস্কৃত ভাষা বৈদিক ভাষা হতে ভিন্নতর কোনো ভাষা নয়, তাই বৈদিক ভাষার রচনাকালই সংস্কৃত ভাষার রচনাকাল মনে করা যায়। এ ভাষার দৃষ্টান্ত খুঁজতে হলে আমাদের বেদপরবর্তী লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকাতে হয়। সংস্কৃত ভাষার দৃষ্টান্ত হিসেবে বাল্মীকির *রামায়ণের* দুটি শ্লোক এবং কালিদাসের *কুমারসম্ভবের* একটি শ্লোক দেবনাগরী ও বাংলা বর্ণমালার মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

এক. यदि वाचां प्रदास्यामि
द्विजातिरिव संस्कृताम्।
रावणं मन्यमाना मां
सीता भीता भविष्यति॥

দুই. अवश्यमेव वक्तव्यं
मानुषं वाक्यमर्थवत्।
मया सान्त्वयितुं शक्या
नान्यथेयमनिन्दिता॥

এক. যদি বাচং প্রদাস্যামি
দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং
সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥

দুই. অবশ্যমেব বক্তব্যং
মানুষং বাক্যমর্থবৎ।
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা
নান্যথেয়মনিন্দিতা॥

সুন্দর কাণ্ড (সু. কা.) ৩০/১৮ (অমরেশ্বর ২০১৫: ৩৭৫৬) সু. কা. ৩০/১৯ (অমরেশ্বর ২০১৫: ৩৭৫৬)

[শ্লোক দুটির বাংলা অনুবাদ: যদি আমি (হনুমান) দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ) ন্যায় সংস্কৃতে (সংস্কৃত ভাষায়) কথা বলি, তাহলে আমাকে রাবণ মনে করে সীতা ভীতা হবেন। সুতরাং অর্থবান্ মানুষবাক্য (প্রাকৃতজনের ভাষা, প্রচলিত ভাষা) বলা আবশ্যক। অন্যথায় আমি এ অনিন্দিতা সীতাকে আশ্বাস দিতে সমর্থ হব না।]

এক. द्विधा प्रयुक्तेन च वाङ्मयेन सरस्वती तन्मिथुनं नुनाव।
संस्कारपूतेन वरं वरेण्यं बधूं सुखग्राह्य-निवन्धनेन॥

এক. দ্বিধা প্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং বধূং সুখগ্রাহ্য-নিবন্ধনেন॥

কালিদাস, কুমারসম্ভবম্, ৭/৯০ (মুরারিমোহন ২০১১: ৩১৫/২৫৮)

[বাংলা অনুবাদ: সরস্বতী সেই দম্পতির (শিব ও উমা) স্তব করলেন দ্বিবিধ শব্দ গঠিত ভাষায়—বরেণ্য বর শিবকে সংস্কারপূত সংস্কৃত ভাষায়, উমাকে শ্রুতিমধুর প্রাকৃতে।]

উল্লেখ্য, সংস্কৃতে সাধারণত পুরুষেরা এবং নারীরা প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ লোকের ভাষায় কথা বলত। এ ক্ষেত্রেও সেটি পরিলক্ষিত। দৃষ্টান্তগুলো থেকে বলা যায়, বৈদিক ভাষার সংস্কারকৃত বা পরিশীলিত রূপ হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা। তবে এ ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। দেবনাগরী, বাংলাসহ অনেক ভাষার বর্ণমালা দ্বারা এ ভাষাকে প্রকাশ করা যায়। সংস্কৃত ভাষার বৈয়াকরণদের মধ্যমণি পাণিনি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ জগতের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ করলেও সংস্কৃত ভাষাকে দেবনাগরী লিপির মাধ্যমেই প্রকশ করেছেন। তিনি পৃথক কোনো বর্ণমালার প্রয়োজন মনে করেননি। তাই বর্তমানে দেবনাগরী ও বাংলা ভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে এ ভাষার বেশি চর্চা হয়ে থাকে। এ প্রবন্ধে দেবনাগরী ও বাংলা ভাষার বর্ণমালা কীভাবে সংস্কৃত বর্ণমালা হিসেবে লিখিত, পঠিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে তা উপস্থাপন করাই মূল উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত বর্ণমালা

প্রথমেই আমরা সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে কী নেই তা অনুসন্ধানে তৎপর হব। সাধারণত সংস্কৃত বৃ-ধাতুর সাথে ন-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'বর্ণ' শব্দটি সৃষ্ট হয়েছে [√বৃ (বর্ণনা করা) + ন = বর্ণ (অ আ; ক খ/অ আ; ক খ প্রভৃতি বর্ণ বা অক্ষর)]। আর সংস্কৃত লিপ্ ধাতুর সাথে ইন্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'লিপি' শব্দটি সৃষ্ট হয়েছে [√লিপ্ (বিন্যাস করা) + ইন্ = লিপি (অক্ষর বিন্যাস) Letters]। বর্ণ ও লিপি মূলত একই বিষয়। অর্থাৎ দুটিরই অর্থ অক্ষর। আমরা জানি, যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণের তিনটি আলোচ্য বিষয়ের (বর্ণবিচার, শব্দবিচার ও বাক্যবিচার) মধ্যে বর্ণবিচার অন্যতম। বর্ণবিচারে বর্ণের ভেদ, উচ্চারণ, বানান প্রভৃতির আলোচনা করা হয়। ভারতবর্ষে আর্যজাতির আগমনের পূর্বে সিন্ধু সভ্যতায় লিখনপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক সভ্যতার প্রারম্ভে লিখনপদ্ধতি ছিল না। তাই বহুকাল যাবৎ বৈদিক সাহিত্য মৌখিক ঐতিহ্যে প্রবাহিত হয়েছিল। এ কারণেই বেদের অপর নাম হয়েছে শ্রুতি। তবে সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয় কখন আর্যদের বর্ণমালা ভারতে প্রথম চালু হয়। বিভিন্ন নথিপত্র থেকে জানা যায় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বর্ণমালা প্রথম চালু হয় (বিশ্বরূপ ১৯৯৭: ২০)। আর তখন থেকে আমরা খরোষ্ঠীলিপি (ডান থেকে বামে লেখা হয়) ও ব্রাহ্মীলিপি (বাম থেকে ডানে লেখা হয়) নামে দুপ্রকার লিপির কথা জানতে পারি। উল্লেখ্য, ব্রাহ্মীলিপি থেকেই আধুনিক ভারতীয় লিপি (দেবনাগরী, বাংলা প্রভৃতি) উদ্ভূত হয়। এই বর্ণমালা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। একসময় ব্রাহ্মী বর্ণমালা আঞ্চলিক বর্ণমালাতে পরিণত হয়। বিশ্বরূপ সাহার মতে, খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শিলালেখ থেকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় ভেদে দুপ্রকার ব্রাহ্মী বর্ণমালার পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালা দেবনাগরী [√দিব্ (দীপ্তি করে) + অচ্ = দেব, নগর (স্থান) + স্ত্রিয়াং ঙীপ্ = নাগরী, দেবানাং নাগরী = দেবনাগরী] বর্ণমালা নামে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ দেব নামক আর্যগণ (গৌরবর্ণ দীপ্তিমান-সম্পন্ন) নগরে গৈরিক প্রভৃতি বর্ণের (= রঙের) সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির সংকেতকে ভিন্ন ভিন্ন আকারের বর্ণে প্রকাশ করে। কালক্রমে গৈরিক প্রভৃতি বর্ণের লিখনপদ্ধতি বিস্তার লাভ করলে তাদের ব্যবহৃত

বর্ণমালাকে তারা 'দেবনাগরী' সংক্ষেপে 'নাগরী' বলত (বিশ্বরূপ ১৯৯৭: ২০-২১)। উল্লেখ্য, এই বর্ণগুলোকে মালার মতো গ্রথিত করায় একে বর্ণমালা নামেও অভিহিত করা হয়। এ বর্ণমালায় আর্যজাতির লিখিত ভাষাকে দেবভাষা বা বৈদিক ভাষা বলা হয়। একসময় এ ভাষা সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয় (পূর্বে উল্লেখিত)। অতঃপর বৈয়াকরণ পাণিনি একে সংস্কার করেন। তাই বৈদিক ভাষার সংস্কারকৃত রূপই সংস্কৃত ভাষা। পাণিনি বৈদিক ভাষার সংস্কার করলেও দেবনাগরী বর্ণমালার কোনো সংস্কার করেননি। অর্থাৎ দেবনাগরী বর্ণমালা দিয়েই তিনি সংস্কৃত ভাষা প্রকাশ করেছেন। আর তখন থেকেই দেবনাগরী বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালা হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বংলা বর্ণমালাসহ আধুনিক বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা এ ভাষার (সংস্কৃত) বাহকরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষার যেহেতু নিজস্ব বর্ণমালা নেই সেহেতু আলোচ্য প্রবন্ধটিতে দেবনাগরী (প্রসঙ্গক্রমে) ও বাংলা বর্ণমালার মাধ্যমেই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) সংস্কৃত ভাষার বর্ণসহ যাবতীয় বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। পূর্বেই উক্ত হয়েছে আর্যরা রঙযুক্ত উপকরণের দ্বারা সাঙ্কেতিক চিহ্ন ধ্বনিকে প্রকাশ করতে বর্ণ (অ আ; ক খ /অ আ; ক খ প্রভৃতি বর্ণ বা অক্ষর) শব্দে ব্যবহার করত। তাই ধ্বনির (ভাষাতত্ত্বে মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজ) লিখিত রূপ হচ্ছে বর্ণ (Letters)। প্রথমে স্বরবর্ণ (হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত; অ আ আ৩ প্রভৃতি অক্ষর) সৃষ্ট হয়। অতঃপর বর্ণমালায় উচ্চারণের ক্রমানুসারে এসেছে ব্যঞ্জনবর্ণ (ক খ প্রভৃতি অক্ষর) (বিশ্বরূপ ১৯৯৭: ২০)। তাই বর্ণ দুপ্রকার। যথা: স্বরবর্ণ (Vowels) ও ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonant)।

কথিত আছে ভগবান শিব নৃত্তাবসানে চৌদ্দবার ঢক্কানিনাদ করেছিলেন এবং তা থেকেই চতুর্দশ মাহেশ্বর সূত্রের (শিবসূত্রের) উদ্ভব। নন্দিকেশ্বরকৃত 'কাশিকা'য় এ সম্পর্কে উক্ত হয়:

> নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
> উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥ (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ১)

চতুর্দশ মাহেশ্বর সূত্রসমূহের বিন্যাস এবং এদের সাহায্যে সংক্ষেপে সূত্র-নির্মাণ পাণিনিসহ ভারতীয় বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের অকল্পনীয় মনীষার পরিচয় বহন করে। এসব সূত্র থেকেই আজ আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয় পেয়ে থাকি। শিবসূত্রে বর্ণসমূহের পাঠক্রম দেবনাগরী (< ব্রাহ্মী বর্ণমালা) ও বাংলা (< ব্রাহ্মী বর্ণমালা) বর্ণমালায় পর্যায়ক্রমে প্রদর্শিত হলো:

দেবনাগরী বর্ণমালা (< ব্রাহ্মী বর্ণমালা):

[ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত]

দেবনাগরী বর্ণমালাতে শিবসূত্র

১. অ ই উ ণ্	৮. ঝ ভ ঞ্
২. ঋ ল ক্	৯. ঘ ঢ ধ ষ্
৩. এ ও ঙ্	১০. জ ব গ ড দ শ্ [ব = বর্গীয় ব (ৰ), পেটটি কর্তিত]
৪. ঐ ঔ চ্	১১. খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্
৫. হ য ব র ট্	১২. ক প য্
৬. ল ণ্	১৩. শ ষ স র্
৭. ঞ ম ঙ ণ ন ম্	১৪. হ ল্

উল্লেখ্য, বর্গীয় ব (আকৃতি: ৰ, উচ্চারণ: সংস্কৃতে—ইংরেজি 'B') এবং অন্তঃস্থ ব [আকৃতি: ব, উচ্চারণ: ইংরেজি 'W/V' (সংস্কৃতে—উয়/ওয় = উ-অ/ও-অ, ভি)]-এর আকৃতি ও উচ্চারণ ভিন্ন। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

অনেকে মনে করেণ উক্ত দেবনাগরী বর্ণমালাই সংস্কৃত বর্ণমালা। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। কারণ সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। বর্তমানে এ ভাষাকে অনেক ভাষার (বৈদিক, বংলা, রোমান প্রভৃতি) বর্ণমালা দ্বারাই প্রকাশ করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলা বর্ণমালাকেই

মূলত সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা রূপে তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় ৩০০০ বছর ধরে ব্রাহ্মীলিপি থেকে বিবর্তিত হতে হতে বাংলা বর্ণমালাগুলো আজ নিম্নের রূপ পেয়েছে।

বাংলা বর্ণমালা (<ব্রাহ্মী বর্ণমালা):

[ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত]

বাংলা বর্ণমালাতে শিবসূত্র

১. অ ই উ ণ্
২. ঋ ঌ ক্
৩. এ ও ঙ্
৪. ঐ ঔ চ্
৫. হ য ব র ট্
৬. ল ণ্
৭. ঞ ম ঙ ণ ন ম্
৮. ঝ ভ ঞ্
৯. ঘ ঢ ধ ষ্
১০. জ ব গ ড দ শ্
১১. খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্
১২. ক প য়্
১৩. শ ষ স র্
১৪. হ ল্

উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলা ভাষায় বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ ব-এর আকৃতি ও উচ্চারণ অভিন্ন বিধায় অন্তঃস্থ ব-কে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু বাংলা শব্দে খুব সীমিত ক্ষেত্রে অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ আছে।

পাণিনি উক্ত চতুর্দশ মাহেশ্বর সূত্র অবলম্বন করেই তাঁর *অষ্টাধ্যায়ী* রচনা করেছেন। এদের কোনো সূত্র হতে একটি বর্ণ এবং তার সাথে সেই সূত্র বা অন্য কোনো সূত্রের অন্তে স্থিত হলন্ত বা হসন্ত (স্বরহীন) বর্ণগুলোর কোনো একটি নিয়ে এক একটি প্রত্যাহার (সংক্ষিপ্তকরণ) সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়। তাই উক্ত হয়:

> প্রত্যাহ্রিয়ন্তে সংক্ষিপ্যন্তে বর্ণা যস্মিন্ স প্রত্যাহারঃ। (চক্রবর্তী ২০০৩: ৭)

[প্রতি-আ-√হৃ + ঘঞ্ করণে = প্রত্যাহারঃ]

অর্থাৎ, যার দ্বারা সংক্ষেপে অনেক বর্ণের উপলব্ধি হয়, তাই প্রত্যাহার।

স্বরবর্ণ (Vowels অচ্)

যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র উচ্চারিত হতে পারে, তাদেরকে স্বরবর্ণ বলে। তাই উক্ত হয়:

স্বরঃ স্বয়ং রাজতে/স্বয়ং রাজন্তে যে তে স্বরাঃ। (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ২)

উল্লেখ্য, স্বরবর্ণ স্বনির্ভরশীল অর্থাৎ নিজে নিজেই উচ্চারিত হতে পারে।

শিবসূত্র থেকে অচ্ (> সমস্ত স্বরবর্ণ) প্রত্যাহার গঠন

১. অ ই উ ণ্
২. ঋ ৯ ক্
৩. এ ও ঙ্
৪. ঐ ঔ চ্

উল্লিখিত ১-৪ নং সূত্র কয়টি 'অচ্' বলে নির্দেশ করে। যাদের মধ্যে রয়েছে সমস্ত স্বরবর্ণ। তাই স্বরবর্ণের অপর নাম অচ্ বর্ণ। সুতরাং 'অচ্' প্রত্যাহার = অ ই উ ঋ ৯ এ ও ঐ ঔ = ৯টি।

স্মর্তব্য, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে অণ্ থেকে হল্ পর্যন্ত ৪১টি প্রত্যাহারসংজ্ঞা দৃষ্ট হয় (দিলীপ ১৯৯১: ৪৬-৪৭)। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

ঙ্, ঞ্, ণ্, ব্, ট্-কার নিয়ে এক একটি করে:

১. এঙ্
২. যঞ্
৩. অণ্
৪. ছব্
৫. অট্ = ৫ টি

ষ্-কার নিয়ে:

৬. ঝষ্
৭. ভষ্ = ২ টি

ক্, ণ্ ও ম্-কার নিয়ে প্রত্যেক স্থলে ৩টি করে মোট:

৮. অক্

৯. ইক্
১০. উক্
১১. অণ্
১২. ইণ্
১৩. যণ্
১৪. অম্
১৫. যম্
১৬. ঙম্ = ৯টি

চ্ ও য় নিয়ে প্রত্যেক স্থলে ৪টি করে মোট:

১৭. অচ্
১৮. ইচ্
১৯. এচ্
২০. ঐচ্
২১. যয়্
২২. ময়্
২৩. ঝয়্
২৪. খয় = ৮টি

র্-কার নিয়ে:

২৫. যর্
২৬. ঝর্
২৭. খর্
২৮. চর্
২৯. শর্ = ৫টি

শ্ ও ল্-কার নিয়ে প্রত্যেক স্থলে ৬টি করে মোট:

৩০. অশ্
৩১. হশ্
৩২. বশ্
৩৩. জশ্
৩৪. ঝশ্
৩৫. বশ্
৩৬. অল্
৩৭. হল্
৩৮. বল্
৩৯. রল্
৪০. ঝল্
৪১. শল্ = ১২টি

মোট = ৪১ টি

উল্লেখ্য, বার্ত্তিক ও উণাদি সূত্রে যথাক্রমে চয় ও ঞম্—এ দুটি প্রত্যাহারের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। অতএব অষ্টাধ্যায়ী ৪১টি ও বার্ত্তিক-উণাদি ২টি মিলে মোট প্রত্যাহার ৪১+২ = ৪৩টি।

স্বরবর্ণ থেক হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর, প্লুতস্বর ও সন্ধ্যক্ষর নির্ণয়

হ্রস্বস্বর নির্ণয়:

হ্রস্বং লঘু [পাণিনি (পা.) ১/৪/১০] (তপনশঙ্কর ২০১২: ৪৫)।

হ্রস্বস্বরকে লঘু বলা হয়। স্বরধ্বনির লঘু স্বর ৫টি। যেমন—হ্রস্বস্বর/লঘুস্বর = অ ই উ ঋ ঌ = ৫টি।

উল্লেখ্য, হ্রস্বস্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণও লঘু হয়। যেমন—ক (ক্ + অ), খি (খ্ + ই) ইত্যাদি।

দীর্ঘস্বর ও প্লুতস্বর নির্ণয়:

উপর্যুক্ত ৯টি স্বরবর্ণ হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত ভেদে অনেক প্রকার রূপ হয়। পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ীর* শেষ সূত্রের সাহায্যে একসঙ্গে হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত স্বর নির্ণয় করা যায়। যেমন—অ অ (পা. ৮/৪/৬৮) (তপনশঙ্কর ২০১২: ৬৮২)।

> অর্থাৎ, হ্রস্ব অ = অ। দীর্ঘ অ = আ। প্লুত অ = আ^{৩}

বাকি স্বরবর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত স্বর অনুরূপভাবে নির্ণয় করা যায়।

হ্রস্বস্বরের এক মাত্রা, দীর্ঘস্বরের দুই মাত্রা ও প্লুতস্বরের (Prolated Vowel) তিন মাত্রা হয়। সাধারণত হ্রস্বস্বরের সাথে ১, ২ ও ৩ এই অঙ্কবাচক সংখ্যা পাওয়ার বা সূচক হিসেবে বসিয়ে হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত স্বরের মাত্রা বোঝানো হয়। প্লুতস্বর সম্পর্কে উক্ত হয়—প্লবতে লঙ্ঘতে হ্রস্বদীর্ঘবিতি প্লুতঃ (বিশ্বরূপ ১৯৯৭: ২৪)।

স্মর্তব্য, স্বরের মাত্রা সংখ্যা গণনার উপায় সম্পর্কে *ছন্দোমঞ্জরীতে* উক্ত হয়:

> একমাত্রো ভবেৎ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
> ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনমর্ধমাত্রকম্॥ (গুরুনাথবিদ্যানিধি ১৪০৯: ২)

অর্থাৎ, হ্রস্ব অ = অ^{১}। দীর্ঘ অ = আ^{২}। প্লুত অ = আ^{৩}

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্লুতস্বর ব্যবহারিক ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। তাই এ প্রবন্ধে আর উল্লেখ করা হয়নি।

অনুরূপভাবে ই উ ঋ ঌ-এর দীর্ঘ স্বর:

> হ্রস্ব ই = ই। দীর্ঘ ই = ঈ
> হ্রস্ব উ = উ। দীর্ঘ উ = ঊ
> হ্রস্ব ঋ = ঋ। দীর্ঘ ঋ = ৠ
> হ্রস্ব ঌ = ঌ। দীর্ঘ ঌ = ঌ^{৩}

সুতরাং দীর্ঘস্বর = আ ঈ ঊ ঋ ঌ = ৫টি

আবার, পাণিনির নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যেও দীর্ঘস্বর নির্ণয় করা যায়:

ক) অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ (পা. ৬/১/১০১)। (তপনশঙ্কর ২০১২: ৬৮২)
[অক্ = অ ই উ ঋ ঌ]

খ) একঃ পূর্বপরয়োঃ (পা. ৬/১/৮৪)। (তপনশঙ্কর ২০১২: ৪৩৩)

সন্ধির মাধ্যমে:

অ/আ + অ/আ = আ [নর + অধমঃ = নরাধমঃ প্রভৃতি]

ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ [রবি + ইন্দ্রঃ = রবীন্দ্রঃ প্রভৃতি]

উ/ঊ + উ/ঊ = ঊ [কটু + উক্তিঃ = কটূক্তিঃ প্রভৃতি]

ঋ/ৠ + ঋ/ৠ = ৠ [পিতৃ + ঋণম্ = পিতৃৠণম্ প্রভৃতি]

ঋ + ঌ = ৠ/ঌ [হোতৃ + ঌকারঃ = হোতৃৠকারঃ/হোত্ঌকারঃ প্রভৃতি]

সন্ধ্যক্ষর নির্ণয় (স্বরবর্ণ থেকে স্বরবর্ণ):

দুটি স্বরধ্বনি সন্ধি হয়ে যে স্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাকে সন্ধ্যক্ষর (= সন্ধি + অক্ষর) বলে। তাই উক্ত হয়:

সন্ধৌ সত্যক্ষরং সন্ধ্যক্ষরম্। (বিশ্বরূপ ১৯৯৭: ২৬)

অর্থাৎ, সন্ধির ফলে যে অক্ষরের (= বর্ণের) সৃষ্টি হয় তাকে সন্ধ্যক্ষর বলে।

সন্ধ্যক্ষর ৪টি—এ ও ঐ ঔ। এদের অবয়বে দুটি করে বর্ণ আছে। পাণিনির মতে:

ক) আদ্গুণঃ (পা. ৬/১/৮৭)। (তপনশঙ্কর ২০১২: ৪৩৩)

[অদেঙ্ গুণঃ (পা. ১/১/২), অৎ (অ-এর পর) + এঙ্ + গুণঃ, এঙ্ = এ ও; আৎ (আ-এর পর) + গুণঃ, উরণ্ রপরঃ (পা. ১/১/৫১) সূত্রানুসারে]

সন্ধির মাধ্যমে:

এ: অ/আ + ই/ঈ = এ [দেব + ইন্দ্রঃ = দেবেন্দ্রঃ, রমা + ঈশঃ = রমেশঃ]

ও: অ/আ + উ/ঊ = ও [সূর্য + উদয়ঃ = সূর্যোদয়ঃ, গঙ্গা + ঊর্মিঃ = গঙ্গোর্মিঃ]

খ) বৃদ্ধিরেচি (পা. ৬/১/৮৮)। (তপনশঙ্কর ২০১২: ৪৩৩)

[বৃদ্ধিরাদৈচ্ (পা. ১/১/১), বৃদ্ধিঃ + আৎ (আ-এর পর) + ঐচ্, ঐচ্ = ঐ ঔ; বৃদ্ধিঃ + এচি, এচ্ = এ ও ঐ ঔ সূত্রানুসারে]

সন্ধির মাধ্যমে:

ঐ/ঔ: অ/আ + এ/ও = ঐ/ঔ

[জন + একঃ = জনৈকঃ, সদা + এব = সদৈব; জল + ওঘঃ = জলৌঘঃ (জলের প্রবাহ), গঙ্গা + ওঘঃ=গঙ্গৌঘঃ (গঙ্গার প্রবাহ)]

ঐ/ঔ: অ/আ + ঐ/ঔ = ঐ/ঔ

[মত + ঐক্যম্ = মতৈক্যম্, মহা + ঐরাবতঃ = মহৈরাবতঃ; তব + ঔৎসুক্যম্ = তবৌৎসুক্যম্, সদা + ঔৎসুক্যম্ = সদৌৎসুক্যম্]

উল্লেখ্য, এদের অবয়বে দুটি করে বর্ণ থাকা সত্ত্বেও এক বর্ণের মতোই ব্যবহার হয়। তাই উক্ত হয়:

সন্ধ্যক্ষরাণি সংস্পৃষ্টবর্ণান্যেকবর্ণবৃত্তিঃ। (বিশ্বরূপ ১৯৯৭: ২৬)

তাহলে স্বরবর্ণের মোট সংখ্যা = হ্রস্বস্বর + দীর্ঘস্বর + সন্ধ্যক্ষর

= (অ ই উ ঋ ঌ) + (আ ঈ ঊ ৠ ঌ৾) + (এ ও ঐ ঔ)

= ৫ + ৫ + ৪ = ১৪টি

[অ ই উ ঋ ঌ আ ঈ ঊ ৠ ঌ৾ এ ও ঐ ঔ = ১৪টি]

বর্তমানে সংস্কৃত ভাষায় স্বরবর্ণগুলোকে নিম্নোক্তভাবে সাজনো হয়:

অ আ ই ঈ
উ ঊ ঋ ৠ
ঌ ঌ৾
এ ঐ ও ঔ = ১৪টি

অথবা,

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ঌ৾ এ ও ঐ ঔ = ১৪টি

সংস্কৃতে ঌ-এর প্রয়োগ অতি বিরল। কেবল ক্লৃপ্-ধাতু স্থলেই এর প্রয়োগ দেখা যায়। কৃপো রো লঃ (পা. ৮/২/১৮) সূত্রানুসারে কৃপ্ (চিন্তা করা, কল্পনা করা)-ধাতুর ঋ > ঌ [ঌ = ল] আদেশ হয়ে উক্ত ধাতুটি সৃষ্টি হয়েছে [কৃপ্ > ক্লৃপ্ > ক্ঌপ্] (তপনশঙ্কর ২০১২: ৬৩৪)। যেমন—কল্পতে (কল্পনা করা), ক্ঌপ্তঃ, কল্প্তা ইত্যাদি।

দেবনাগরী [ঌ৾]-কে বর্তমানে সংস্কৃতে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে সংস্কৃতে স্বরবর্ণ ১৩টি। সাধারণত সন্ধিতে ঋ ৠ; ঌ ঌ৾-এর ব্যবহার দেখা যায়। দৃষ্টন্তস্বরূপ:

ঋ ৠ সন্ধিতে ব্যবহার (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ১৫):

পিতৃ + ঋণম্ = পিতৃৃণম্, পিতৃ + আলয়ঃ = পিত্রালয়ঃ,

মাতৃ + ঋণম্ = মাতৃৃণম্, মাতৃ + আলয়ঃ = মাত্রালয়ঃ,

ৠ + আকারঃ = রাকারঃ ইত্যাদি। [ৠ = র]

ৠ-কার (ৠ) যুক্ত শব্দ হিসেবে পিতৃ, মাতৃ, দাতৃ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন ও ষষ্ঠীর বহুবচন রূপ পাওয়া যায় (বিশ্বরূপ ১৯৯৭: ২৬)। যেমন:

দ্বিতীয়ার বহুবচন—পিতৃৄন্, মাতৃৄঃ, দাতৃৄন্
ষষ্ঠীর বহুবচন—পিতৃৃণাম্, মাতৃৃণাম্, দাতৃৃণাম্

৯ ৯^{৯} সন্ধিতে ব্যবহার (বিদ্যাভূষণ ১৯০৩: ২৪):

৯ + আকৃতিঃ = লাকৃতিঃ [৯ = ল], ৯^{৯} + উৎসবঃ = লুৎসবঃ [৯^{৯} = ল], হোতৃ + ৯কারঃ = হোতৃকারঃ, হোত৯^{৯} কারঃ (পুরোহিত, ঋগ্বেদজ্ঞ) [ঋ + ৯ = ৠ/৯^{৯}] ইত্যাদি।

৯ কেবল একটি ধাতুতে পাওয়া যায় (পূর্বে উক্ত)। যেমন—ক্লৃপ্ (> ক্৯প্) ধাতু। অর্থ চিন্তা বা কল্পনা করা (বিশ্বরূপ ১৯৯৭: ২৫—২৬)। প্রয়োগ—ক্লুপ্তঃ, প্রক্লৃপ্তঃ ইত্যাদি।

৯-যুক্ত একটি শব্দ '৯তক'ও পাওয়া যায় (বিশ্বরূপ ১৯৯৭: ২৫)। বাক্যে প্রয়োগ—

৯তক-কে দই দাও—দধি ৯তকায়/দধ্য৯তকায় দেহি।

৯তক-কে মধু দাও—মধু ৯তকায়/মধ্ব৯তকায় দেহি ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণমালাকে সংস্কার করেন। তিনি সংস্কৃত ১৪টি স্বরবর্ণের মধ্যে সপ্তম-অষ্টম বর্ণ দুটির (ঋ ৠ) ৠ এবং নবম-দশম বর্ণ দুটির (৯ ৯^{৯}) ৯^{৯}-কে বাদ দিয়েছেন। অধুনা ৯-কেও বাদ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে বাংলায় স্বরবর্ণ ১১টি। বর্তমানে ঋ বর্ণটিও স্বরবর্ণের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কেননা ঋ-এর কাজ 'রি' দ্বারা সম্পন্ন করা যায় (নরেন ১৯৯৯: ৩৪)। যেমন—ঋতু > রিতু, ঋষি > রিশি প্রভৃতি।

বর্তমানে বাংলা ভাষার স্বরবর্ণকে সাজালে দাঁড়ায়—

অ আ ই ঈ
উ ঊ ঋ
এ ঐ ও ঔ = ১১টি

অথবা,

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ও ঐ ঔ = ১১টি

উল্লেখ্য, অনেকে অ আ এই দুবর্ণ স্থলে স্বরের অ, স্বরের আ বলে থাকে। এভাবে বলা ভুল। কেবল অ আ এরূপ বলতে হবে (শর্ম্মা ১৯৩২: ২৫৯)।

ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonant হল্)

যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের আশ্রয়বিনা স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয় না, তাদেরকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। এ সম্পর্কে শৌনকের ঋক্প্রাতিশাখ্যে উবট ভাষ্যে বলা হয়েছে—ব্যঞ্জয়ন্তি প্রকটান্ কুর্বন্তি অর্থান্ ইতি ব্যঞ্জনানি (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ২)। অন্যভাবে বলা যায় ব্যঞ্জনবর্ণ পরনির্ভরশীল, কিন্তু স্বর নিজেই উচ্চারিত হতে পারে। তাই উক্ত হয়:

> ব্যঞ্জনমন্বক্, স্বরঃ স্বয়ং রাজতে। (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ২)

শিবসূত্র থেকে হল্ (> সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ) প্রত্যাহার গঠন

৫. হ য ব র ট্	১০. জ ব গ ড দ শ্
৬. ল ণ্	১১. খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্
৭. ঞ ম ঙ ণ ন ম্	১২. ক প য়
৮. ঝ ভ ঞ	১৩. শ ষ সর্
৯. ঘ ঢ ধ ষ্	১৪. হ ল্ = 'হল্' প্রত্যাহার = সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ = ৩৪টি

উল্লিখিত ৫-১৪ নং সূত্র (১০টি) কয়টি 'হল্' বলে নির্দেশ করে। এদের মধ্যে রয়েছে সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ। তাই ব্যঞ্জনবর্ণের অপর নাম হল্ বর্ণ। যেমন—

> 'হল্' প্রত্যাহার = হ য ব র ল ঞ ম ঙ ণ ন ঝ ভ ঘ ঢ ধ জ ব গ ড দ খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ক প শ ষ স হ = ৩৪টি

এই ৩৪টি 'হল্' বর্ণই ব্যঞ্জনবর্ণ নামে পরিচিত। স্মর্তব্য, 'হল্' প্রত্যাহারের মধ্যে দুবার 'হ' রয়েছে (৫ নং ও ১৪ নং সূত্রে)। তাই একবার 'হ' গণনা করলে ব্যঞ্জনবর্ণ হবে ৩৩টি।

উল্লেখ্য, সংজ্ঞাকরণের জন্যই শিবসূত্রে দুবার হ-কার পাঠ করা হয়েছে। তদ্রূপ, 'অণ্' এবং 'লণ্' প্রত্যাহারের ক্ষেত্রেও দুবার ণ-কার ব্যবহৃত হয়েছে।

উক্ত ৩৩টি ব্যঞ্জনবর্ণ স্পর্শ-অন্তঃস্থ-উষ্ম ভেদে অনেক প্রকার রূপ হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনবর্ণের স্বরূপ বোঝাবার জন্য (্) চিহ্ন ব্যবহার করে হলন্ত বা হসন্ত রূপে লেখা হলো। তবে পড়বার সময় এগুলো অ-কারান্ত করেই উচ্চারণ করা হয়। যেমন—ক (ক্ + অ), খ (খ্ + অ), গ (গ্ + অ) ইত্যাদি। এখানে স্মর্তব্য, কেবল 'অ' স্বরবর্ণেরই কোনো মাত্রা নেই। 'অ' বর্ণের সংযোগে হল্-বোধক চিহ্নটি (্) লুপ্ত হয়। আর হল্ বা হস্ চিহ্নযুক্ত ধ্বনিকে (ক্ খ্ গ্ ইত্যাদি) হলন্ত বা হসন্ত বলে। বাংলায় হলন্তকে হসন্ত বলে। উক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে 'ক্' থেকে 'ম্' পর্যন্ত ২৫টি স্পর্শবর্ণ (Mutes)। এরা আবার পাঁচ বর্গে (Group) বিভক্ত। এই পাঁচ বর্গকে সংক্ষেপে 'কু চু টু তু পু' বলে অভিহিত করা হয়। বর্গগুলো সাজিয়ে পাই—

> স্পর্শবর্ণ:
> ক-বর্গ (কু) = ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্

চ-বর্গ (চু) = চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্
ট-বর্গ (টু) = ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্
ত-বর্গ (তু) = ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্
প-বর্গ (পু) = প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ = ২৫টি

এসকল স্পর্শবর্ণ মুখবিবরে জিহ্বার সাহায্যে বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করে অথবা ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানের পরস্পর স্পর্শ দ্বারা উচ্চারিত হয়। তাই উক্ত হয়:

কাদয়ো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ। (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ৩)

আবার 'য্' থেকে 'ব্' পর্যন্ত ৪টি অন্তঃস্থ-বর্ণ অর্থাৎ 'য-র-ল-বা অন্তস্থাঃ' (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ৪)। বর্ণগুলো সাজিয়ে পাই—

অন্তঃস্থ-বর্ণ: য্ র্ ল্ ব্ = ৪টি

আবার 'শ্' থেকে 'হ্' পর্যন্ত ৪টি উষ্ম-বর্ণ অর্থাৎ 'শ-ষ-স-হা উষ্মাণঃ' (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ৪)। বর্ণগুলো সাজিয়ে পাই—

উষ্ম-বর্ণ: শ্ ষ্ স্ হ্ = ৪টি

সুতরাং ব্যঞ্জনবর্ণ: স্পর্শবর্ণ + অন্তঃস্থবর্ণ + উষ্মবর্ণ
= ২৫ + ৪ + ৪
= ৩৩টি

ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ

কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে আবার নতুন ব্যঞ্জনবর্ণ সৃষ্টি হয়। যেমন, অযোগবাহবর্ণ (অনুস্বার ও বিসর্গ = ং ঃ = ২টি), চন্দ্রবিন্দু (ঁ = ১টি) এবং সংযুক্তবর্ণ। অনুস্বার ও বিসর্গের কার্যকারণ-ভাব বিবেচনা করে পাই—

অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুর উৎস: ন্ ম্ > ং, ঁ

এক. ন্ ম্ > ং হয়; এবং ং > ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ য্ ল্ ব্ এই সকল ব্যঞ্জনবর্ণ হয়। সুতরাং অনুস্বারের কার্য ও কারণ উভয়ই ব্যঞ্জন। তাছাড়া অনুস্বার-ঘটিত যেসব সন্ধি হয় বৈয়াকরণেরা সেসব স্বরসন্ধি-প্রকরণে উল্লেখ না করে ব্যঞ্জনসন্ধি-প্রকরণে উল্লেখ করেছেন। এসব কারণেই হয়তো অনুস্বার (ং)-কে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ৩)।

বিসর্গের উৎস: র্ স্ > ঃ

দুই. র্ স্ > ঃ হয়; এবং t > য্ র্ শ্ ষ্ স্ এই সকল ব্যঞ্জনবর্ণ হয়। স্বরকার্যের মধ্যে ঃ > ও-কার (ো) হয়। সুতরাং বিসর্গের ও-কাররূপ (ো) কার্য ভিন্ন সকল কার্য ও কারণ ব্যঞ্জন। আবার বিসর্গ-ঘটিত সন্ধি স্বরসন্ধি-প্রকরণে উল্লেখিত না হয়ে এক স্বতন্ত্র প্রকরণে

ব্যঞ্জনসন্ধির পরে 'বিসর্গসন্ধি' নামে নির্দিষ্ট হয়েছে। এসব কারণে কেউ কেউ বিসর্গ (ঃ)-কে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্থান দিয়েছেন (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ৩)।

তিন. ন্ ম্ > ং হয়; এবং চন্দ্রবিন্দু (ঁ)-কে ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ গণনা করা হয়।

বৈয়াকরণ-শিরোমণি মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি অনুস্বার ও বিসর্গ (ং ঃ)-কে স্বরবর্ণ তালিকা শেষে অ-স্বরবর্ণ সংযোগে (অ আ ই ... অং অঃ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ 'শ্ ষ্ স্'-এর অর্থাৎ উষ্মবর্ণের মধ্যে অ-স্বরবর্ণবিহীন (শ ষ স ং ঃ হ) পাঠ করেছেন। তিনি প্রয়োজনবোধে এ দুটির স্বরত্ব (ণত্ববিধানে এদের স্বরত্ব স্বীকৃত) স্বীকার করেছেন। এজন্য অনুস্বার ও বিসর্গ-কে (ং ঃ) 'অং' 'অঃ' রূপে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে স্থাপন করাই প্রাচীন রীতি (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ৩)। আবার কেউ কেউ বলেন এ দুটি অন্য স্বরের আশ্রয় ভিন্ন উচ্চারিত হয় না। এজন্য এদের স্বরবর্ণের মধ্যে গণনা না করে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যেই গণনা করা উচিত। তাছাড়া অনুস্বার ও বিসর্গ (ং ঃ) মূলত পঞ্চমস্থানীয় নুম্ < ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ 'র্ স্' থেকে জাত। এ জন্য এ দুটিকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা এবং ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যেই গণনা করা উচিত (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ৩)। এসব কারণে বিদ্যাসাগর অনুস্বার ও বিসর্গকে (অং অঃ/ ং ঃ) ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় নিয়ে এসেছেন। আমিও তাঁর এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি।

তাহলে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা = স্পর্শবর্ণ + অন্তঃস্থবর্ণ + উষ্মবর্ণ + অযোগবাহবর্ণ + চন্দ্রবিন্দু
= ২৫ + ৪ + ৪ + ২ + ১
= ৩৬টি

বর্তমানে সংস্কৃত ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো হয়:

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল ব
শ ষ স হ
ং ঃ ঁ = ৩৬টি

অথবা,

ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্ ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্ ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্ প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ য্ র্ ল্ ব্ শ্ ষ্ স্ হ্
ং ঃ ঁ = ৩৬টি।

চার. বাংলায় ড ঢ য এই তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ পদের মধ্যে অথবা অন্তে থাকলে ড় ঢ় য় রূপে এদের আকার ও উচ্চারণে পার্থক্য হয়। বড়, অনূঢ়া, আয় প্রভৃতি বাংলা শব্দ লেখার সময়ে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন এরা স্বতন্ত্র বর্ণ বলে গণ্য হয়। (শর্ম্মা ১৯৩২: ২৫৯)।

পাঁচ. বাংলায় ত ৎ এই দুটি রূপ প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় রূপের নাম খণ্ড ত-কার। ঈষৎ, জগৎ, মহৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লেখার সময়ে ব্যবহৃত হয় (শর্ম্মা ১৯৩২: ২৬০)।

ছয়. কোথাও কোথাও 'ক্ষ্' স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে উল্লেখিত হয়। তাই *পুরুষোত্তমে* উক্ত হয়:

> অকারাদি-ক্ষকারান্তা বর্ণমালা প্রকীর্তিতা। (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ৩)

কিন্তু ক্ + ষ্ = ক্ষ্। এ জন্য পাণিনীয়েরা একে স্বতন্ত্র বর্ণ বলে স্বীকার করেন না। মূলত ক্ষ্ সংযুক্ত বর্ণ।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সার্বিক মূল্যায়নে আমরা বলতে পারি, স্বরবর্ণের তালিকা থেকে যে ঋ, ৠ, ঌ ও ঌ৩-কে এবং ব্যঞ্জনবর্ণ তালিকা থেকে যে অন্তঃস্থ ব-কে বাদ দেওয়া হয়েছে তা আমার মতে বর্ণগুলো বাদ না দিয়ে বর্ণ তালিকার এক প্রান্তে একটু স্থান দিলে ভালো হতো। কারণ সর্বজন বিদিত ভাষার (বর্ণের) ধর্মই হচ্ছে বদলে যাওয়া। তাই আজ হয়তো এদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আগামীতে এদের প্রয়োজন হবে না একথা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের আবার অঘোষ-ঘোষ, অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ ভেদে অনেক প্রকার রূপ হয়। নিম্নে এদের পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো:

অঘোষ (Voiceless, Surd, Hard consonant): বর্গসমূহের প্রথম, দ্বিতীয় ও উষ্মবর্ণ শ্ ষ্ স্-কে (হ বাদে) অঘোষ বর্ণ বলে। তাই উক্ত হয়:

> বর্গাণাং প্রথমদ্বিতীয়াঃ শষসাশ্চাঘোষাঃ। (প্রবোধচন্দ্র ও হৃষীকেশ ১৯৯৮: ৪/ বিশ্বরূপ ১৯৯৭: ২৯)

সুতরাং অঘোষ = বর্গের প্রথম বর্ণ + বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ + উষ্মবর্ণ শ্ ষ্ স্

ক্	খ্	শ্
চ্	ছ্	ষ্
ট্	ঠ্	স্ = ১৩টি
ত্	থ্	
প্	ফ্	

উল্লেখ্য, শিবসূত্রে অঘোষ বর্ণসমূহকে 'খর্' প্রত্যাহার দ্বারা অভিহিত করা হয়।

ঘোষ (Voiced, Sonant, Soft consonant): বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য্ র্ ল্ ব্ হ্-কে ঘোষ বর্ণ বলে। তাই উক্ত হয়—

> অন্যে ঘোষাঃ। (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ৩)

রূপান্তর:

> বর্গাণাং তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমা যরলবহাশ্চ ঘোষবন্তঃ (প্রবোধচন্দ্র ও হৃষীকেশ ১৯৯৮: ৪/ বিশ্বরূপ ১৯৯৭: ২৯)।

সুতরাং ঘোষ = বর্গের তৃতীয় বর্ণ + বর্গের চতুর্থ বর্ণ + বর্গের পঞ্চম বর্ণ + অন্তঃস্থ-বর্ণ + উষ্ম-বর্ণ হ্

গ্	ঘ্	ঙ্	য্	হ্ = ২০টি
জ্	ঝ্	ঞ্	র্	
ড্	ঢ্	ণ্	ল্	
দ্	ধ্	ন্	ব্	
ব্	ভ্	ম্		

উল্লেখ্য, শিবসূত্রে ঘোষ বর্ণসমূহকে 'হশ্' প্রত্যাহার দ্বারা অভিহিত করা হয়।

অল্পপ্রাণ (Unaspirated): বর্গের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম বর্ণ এবং অন্তঃস্থ বর্ণ য্ র্ ল্ ব্-কে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলে। তাই উক্ত হয়:

> বর্গাণাং প্রথমতৃতীয়পঞ্চমা যরলবাশ্চাল্পপ্রাণাঃ। (প্রবোধচন্দ্র ও হৃষীকেশ ১৯৯৮: ৪/ বিশ্বরূপ ১৯৯৭: ৩০)

সুতরাং অল্পপ্রাণ = বর্গের প্রথম বর্ণ + বর্গের তৃতীয় বর্ণ + বর্গের পঞ্চম বর্ণ + অন্তঃস্থ-বর্ণ (Intermediate)

ক্	গ্	ঙ্	য্
চ্	জ্	ঞ্	র্
ট্	ড্	ণ্	ল্
ত্	দ্	ন্	ব্ = ১৯টি
প্	ব্	ম্	

মহাপ্রাণ (Aspirate): বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং উষ্মবর্ণ শ্ ষ্ স্ হ্-কে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে। তাই উক্ত হয়:

> অন্যে মহপ্রাণাঃ। (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ৩)

রূপান্তর:

> বর্গাণাং দ্বিতীয়চতুর্থৌ শষসহাশ্চ মহাপ্রাণাঃ। (প্রবোধচন্দ্র ও হৃষীকেশ ১৯৯৮: ৪/ বিশ্বরূপ ১৯৯৭: ২৯)

সুতরাং মহাপ্রাণ = বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ + বর্গের চতুর্থ বর্ণ + উষ্মবর্ণ (Sibilant)

খ্	ঘ্	শ্
ছ্	ঝ্	ষ্
ঠ্	ঢ্	স্
থ্	ধ্	হ্ = ১৪টি
ফ্	ভ্	

অযোগবাহ বর্ণ: 'অযোগ' অর্থাৎ শিবসূত্রে (অ ই উ ণ্, ঋ ঌ ক্, এ ও ঙ্ প্রভৃতি) যাদের উল্লেখ নাই এবং 'বাহ' অর্থাৎ যারা ষত্ব-ণত্বাদি কার্যবহন বা সম্পন্ন করে তাদেরকে অযোগবাহ বর্ণ বলে। তাই উক্ত হয়:

> অনুস্বারো বিসর্গশ্চ ক পৌ চৈব পরাশ্রিতৌ।
>
> অযোগবাহা বিজ্ঞেয়া আশ্রয়স্থানভাগিনঃ—পাণিনীয়-শিক্ষা (ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৯৯: ৪)।

উল্লেখ্য, অযোগবাহ বর্ণ = ং ঃ প্রতীক দ্বারা সূচিত।

বর্ণমালা (অল্)

যে-কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে একত্রে সে ভাষার বর্ণমালা বলা হয়। যেমন, যে বর্ণমালার মাধ্যমে বৈদিক ভাষা লিখিত হয়, তাকে দেবনাগরী বর্ণমালা বলা হয়। আবার যে বর্ণমালার মাধ্যমে বাংলা ভাষা লিখিত হয়, তাকে বাংলা বর্ণমালা বলা হয়। উপর্যুক্ত আলোচনায় পরিদৃষ্ট হলো সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক ভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা লিখিত ও পঠিত হচ্ছে। সেসবের মধ্যে দেবনাগরী ও বাংলা বর্ণমালা উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য প্রবন্ধটি বাংলা ভাষার বর্ণমালার মাধ্যমেই (প্রসঙ্গক্রমে দেবনাগরী লিপিতে) প্রকাশ করা হয়েছে।

দেবনাগরী বর্ণমালা: স্বরবর্ণ	বাংলা বর্ণমালা: স্বরবর্ণ
অ আ ই ঈ উ	অ আ ই ঈ
ঊ ঋ ৠ ऌ [ৡ]	উ ঊ ঋ
এ ঐ ওঔ = ১৪টি	এ ঐ ও ঔ = ১১টি
[অং অঃ]	
[পতঞ্জলি অনুস্বার ও বিসর্গকে স্বরবর্ণমধ্যে পাঠ করেছেন।]	

অ-কার যোগ করে: ব্যঞ্জনবর্ণ	অ-কার যোগ করে: ব্যঞ্জনবর্ণ
ক খ গ ঘ ঙ	ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ	চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ	ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন	ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম	প ফ ব ভ ম
য র ল ব	য র ল [ব]
শ ষ স হ	শ ষ স হ
অং অঃ অঁ = ৩৬টি	ং ঃ ঁ = ৩৬টি

[বিদ্যাসাগর অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণমধ্যে পাঠ করেছেন।]

উল্লেখ্য, বিদ্যাসাগর ড় ঢ় য় ৎ—এই ৪টি বর্ণ নিজে সৃষ্টি করে উক্ত ৩৬টি ব্যঞ্জনবর্ণের হ-কারের পর এবং ং-এর পূর্বে যোগ করেছেন। তাহলে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা হয় ৪০টি (৩৬ +

৪ = ৪০টি) [ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল (ব) শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ = ৪০টি]। সুতরাং দেবনাগরী তথা সংস্কৃত বর্ণমালা = স্বরবর্ণ + ব্যঞ্জনবর্ণ = (১৪ + ৩৬)টি = ৫০টি এবং বাংলা বর্ণমালা = স্বরবর্ণ + ব্যঞ্জনবর্ণ = (১১ + ৪০)টি = ৫১টি। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় অন্তঃস্থ-বর্ণ ব-কে বাদ দিলে বর্ণমালা হয় ৫০টি। বৈদিক ও সংস্কৃত উভয় ভাষার বর্ণমালা দ্বারাই সংস্কৃত ভাষা প্রকাশ করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে।

একনজরে ছকে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণমালা:

বাংলা বর্ণ	সংখ্যা	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ
মোট বর্ণ	৫০টি	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ [ঋ ৯ ৯৾] এ ঐ ও ঔ = ১১টি	ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল [ব] শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ = ৩৯টি
পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৩২টি	অ আ ই ঈ উ ঊ = ৬টি	ক ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত দ ন ফ ব ভ ম য র ল [ব] ষ স হ ড় ঢ় য় = ২৬টি
অর্ধমাত্রার বর্ণ	৮টি	ঋ = ১টি	খ গ ণ থ ধ প শ = ৭টি
মাত্রাহীন বর্ণ	১০টি	এ ঐ ও ঔ = ৪টি	ঙ ঞ ৎ ং ঃ ঁ = ৬টি

যে-কোনো ভাষার প্রচার ও প্রচারণায় সে ভাষার বর্ণমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু সংস্কৃত বর্ণমালার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। এ ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। অথচ অন্য ভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে সে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বেঁচে আছে। তার মাধুর্য দিয়ে সারা দুনিয়ার পণ্ডিত ব্যক্তিদের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের যে-কোনো ভাষায় ওপর তার মাতৃত্বের প্রভাবও রয়েছে। হিন্দি ও বাংলা ভাষা সেসবের মধ্যে অন্যতম। সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ হিন্দি ও বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে ঐসব ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণবিদদের মধ্যমণি পাণিনি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ জগতের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক। তিনি সংস্কৃত ভাষাকে এমনভাবে বিনির্মাণ করেছেন যা অন্য যে-কোনো ভাষার বর্ণমালা দ্বারা প্রকাশ করা যায় (মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' গীতিকাব্যটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। যার আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে বিভিন্ন লেখক পৃথিবীর প্রায় ৫০টি ভাষায় একে অনুবাদ করেছেন)। আলোচ্য প্রবন্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়। সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা না থাকলেও সে অন্য ভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে চিরদিন বেঁচে থাকবে। এ ক্ষেত্রে হোরেস্ হেম্যান উইলসনের সাথে সুর মিলিয়ে প্রার্থনা করি:

যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্॥ (হাই ২০০৮: ৯)

অর্থাৎ, যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে, যতদিন দাঁড়িয়ে রবে বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্বত, যতদিন প্রবাহিত হবে গঙ্গা-গোদাবরী ততদিন থাকবে সংস্কৃত ভাষাও।

সহায়কপঞ্জি

অমরেশ্বর ঠাকুর (২০১৫)। *বাল্মীকি রামায়ণম্* সুন্দরকাণ্ড ৯। কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি.।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৯৯৯)। *সমগ্র ব্যাকরণকৌমুদী* (আশুতোষ দেব সম্পাদিত)। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির প্রা.লি.।

গুরুনাথবিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য (১৪০৯)। *শ্রীমদ্ গঙ্গাদাস প্রণীত ছন্দোমঞ্জরী* (সম্পাদিত)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (২০১২)। *মহামুনি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য (১৯৯১)। *ভট্টোজিদীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী*। ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী।

নরেন বিশ্বাস (১৯৯৯)। *বাংলা একাডেমী বাংলা উচ্চারণ অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী (১৯৯৮)। *পাণিনীয়ম্ A Higher Sanskrit Grammar And Composition*. কলকাতা: দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী।

বিশ্বরূপ সাহা (১৯৯৭)। *বেদভাষানির্মিতি বা সংস্কৃত ব্যাকরণ*। কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

মুরারিমোহন সেন (২০১১)। 'কালিদাস: কুমারসম্ভব', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (সম্পাদিত)। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৯৯)। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

মুহাম্মদ আবদুল হাই (২০০৮)। *বিদেশীদের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাচর্চা*। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রমেশচন্দ্র দত্ত (২০০০)। *ঋগ্বেদ-সংহিতা* দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী।

রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ (১৯০৩)। *সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রবেশিকা* (কেদারনাথ বসু সম্পাদিত)। কলকাতা।

সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (২০০৩)। *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

সুকুমার সেন (২০১৫)। *ভাষার ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.।

[প্রবন্ধে ব্যবহৃত দেবনাগরী বর্ণমালা (< ব্রাহ্মী বর্ণমালা) ও বাংলা বর্ণমালা (< ব্রাহ্মী বর্ণমালা) অনলাইন সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে।]